International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-IV, January 2015, Page No. 1-7
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

বিবেকানন্দের চেতনায় নারী: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা জে.এন.এম.এস. মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Swamiji always believed that 'mother India' should be the maxim idealism of common Indian women. Often he showed more importance to the mothers of our country and less to the others. In our country since many times of past decades, motherhood is being accepted and gratified by Indian women even as their best policy in life. The selfless tolerant and magnanimous dignity with great grandeur and compassionate heart of Indian women also affect the foreign ladies like Sister Nivedita and some others. The everlasting glorious stories of Sarada ma and Bhuban Mohini Devi, the mother of Swami Vivekananda will never die as we still inspired by their excellence and eternal path-way. In his essays Swami Vivekananda's thoughts and explanations about the hard efforts, scarifying attitude and majestic achievement of Indian women vividly reflects our real heritage towards our Indian culture and humanity.

Key Words: Mother India, Motherhood, Indian Women, Sister Nivedita, Sarada Ma, Bhuban Mohini Devi, humanity

"এদেশের মেয়ের মতো মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ আর দয়াবতী - মেয়েরাই এদেশে সব। ... যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।" যেখানে স্ত্রীলোকের পূজিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন। হেল পরিবার থেকে ১০.০৩.৯৪ সালে রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা এই পত্রেই স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যের (আমেরিকা) নারীদের সম্পর্কে স্পষ্ট অভিব্যক্তির সন্ধান মেলে। আর ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ আমেরিকার আর্ট ইন্সটিটিউটে মহিলা সদনের পক্ষ থেকে স্বামীজীকে দেওয়া দ্বিতীয় সংবর্ধনা সভায় তাঁর ভাববিহ্বল কণ্ঠে বলা কথা কয়টি হলো: "পূর্ণ নারীত্বের আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা।" এখানে সেই নারীত্বের আদর্শ আর শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের আদর্শে সীমাবদ্ধ থাকেনা বরং তা হয়ে ওঠে বিশ্বময়। শুধু পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে নারীর আত্মবলির সুচীমূখকে চিহ্নিত করতেই তাঁর এ বাণীর প্রয়োগ নয় বরং যেন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জুড়ে আবহমান কালব্যাপী সমগ্র বিশ্বে নারীত্বের অধিকারকে সোচ্চারে প্রতিষ্ঠা করার যুগান্তকারী আহ্বানটিই সত্য হয়ে ওঠে তাঁর এ ঘোষণায়। এখন প্রশ্ন হলো, 'নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা'র ব্যাখ্যা স্বামীজীর কাছে কিরূপ ছিল? তার উত্তরে ভারতীয় নারী সম্পর্কে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গিটির আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। ভারতীয় নারীর পবিত্রতা, দয়া আর স্বাধীন মাতৃমূর্ত্তির রূপটিকেই তিনি তাঁর বাণী ও রচনায় প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে পুরুষের পাশাপাশি ভারতীয় নারীর অদম্য সাহসিকতা হয়তো তাঁকে ভাবাতে সাহায্য করেছিল 'কোথা সেই রমণী বীর্যবতী'। স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপ্লবী ভারতীয় নারীর অবদানের কথা কখনই ভোলার নয়। নারীর বীরত্ব অর্থে তাঁর কাছে 'রাজপুত রমণীর বীরত্ব'। বীরত্বহীন নারী যেন অসম্পূর্ণ। সিস্টার কৃষ্টিনের স্মৃতিচারণে পাই স্বামীজীর বলা সেই কথা : "তোমরা আমারই মতো শক্ত সমর্থ। তোমাদের সাহায্য করতে যাবো কোন দুঃখে? মহিলা বলে? ওটা হল শিভালরি। বোঝোনা কেন, ঐ আচরণের মধ্যে নারী-পুরুষের জৈবিক সম্পর্কের মনোভাবটাই প্রচ্ছন্ন থাকে।" (তাঁকে যেমন দেখেছি : সিস্টার কৃস্টিন : চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, সম্পাদনা, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচার)। রাজপুত রমণীরা তাদের স্বামীকে যুদ্ধ সাজে সাজিয়ে বলতেন, 'হয় জয়ী হয়ে ফিরে এসো, নয়তো বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ কর।' বীরত্বের এই অকুণ্ঠ চিত্ততা ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশের নারীর মধ্যে পাওয়া যাবে? সেই প্রাচ্য রমণীকেই তাঁর আহ্বান : "আমি একা, অসহায়। আপনাদের ধন-বল, বুদ্ধি-বল, বিদ্যা-বল... এই এখন মহামন্ত্র - ইংলণ্ড-বিজয়, ইউরোপ-বিজয়, আমেরিকা-বিজয়। তাহাতেই দেশের কল্যাণ।"[১]

বিবেকানন্দের ভাষায় : "ভারতমাতাই নারী চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ।"[২] নারীর জননী ও জায়া রূপের মধ্যে জননী রূপটিকেই অধিকতর গুরুত্ব দান করেছেন স্বামীজী। তিনি বলেন : "ভারতের জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই ইহার শেষ কথা। ...ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব - সেই অপূর্ব, স্বার্থ শূন্য, সর্বংসহা, নিত্য ক্ষমাশীল জননী। ...মাতৃত্বই নারীকে পূর্ণ করে, মাতৃত্বই নারীর নারীত্ব।"[৩] নারীত্বের পূর্ণ স্বরাজ যেন তার মাতৃময়ী রূপ। ভারতমাতা থেকে শুরু করে অতি সাধারণ ভারতীয় গৃহি নারী সকলেই যেন মাতৃত্বের এই কল্যাণময়ী, নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও ক্ষমাশীল স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এখানে নারী সম্পর্কিত তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীটির পার্থক্যও চোখে পড়ে। ভারতে গৃহি নারী সংসার, পরিবার ও পরিজনের রক্ষাকর্তী, পাশ্চাত্যে স্ত্রীকূল সর্বনিয়ন্ত্রক। পাশ্চাত্যের নারী সামান্য অবহেলাতেই স্বামীসহ আত্মজনের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্ত হন। জননীর স্নেহ তার মধ্যে

প্রায়শঃই খুঁজে পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে ভারতীয় নারী অনন্যা। ১৮ই জানুয়ারী, ১৯০০ ক্যালিফোর্ণিয়ার প্যাসাডোনায় শেক্সপীয়ার ক্লাব হাউসে প্রদত্ত বক্তৃতায় 'ভারতীয় নারী' সম্পর্কে তাঁর এমত ভাবনারই স্বাক্ষর মেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কামিনীকাঞ্চন ত্যাগকে ইষ্ট লাভের প্রধান সোপান হিসাবে গুরুত্ব দান করেছিলেন। বিবেকানন্দ কোথাও গুরুর এই মতকে স্পষ্ট বিরোধিতা করেন নি কিন্তু সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা নারী ভাবনা বর্জিত হবেন এমনটিও মেনে নিতে পারেন নি। 'নারী ভাবনা' বলতে সমাজে নারীর উন্নতি ও প্রগতি সম্পর্কে সম্যক ভাবনা বিবেকানন্দের চেতনাকে নিরন্তর আলোড়িত করেছিল। বিবেকানন্দ সমাজে নারী ও পুরুষের সাম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। অন্ততঃ তিনি মনে করতেন যে নারীরা সৎ ও পবিত্র থাকলে তাদের সৎ প্রবৃত্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পুরুষেরাও সৎ ও পবিত্র হয়ে উঠবেন। তাঁর ভাষায় : "সমুদায় জগতে আমরা নৃশংস পতি ও পুরুষের অপবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি, কিন্তু ইহা সত্য নয় যে, নৃশংস পতি ও অপবিত্র নারীর সংখ্যা যত, ঐরূপ পুরুষের সংখ্যাও ঠিক ততো। নারীগণ যেরূপ সগর্বে বলেন – এবং তাহা শুনিয়া লোকেও যেরূপ বিশ্বাস করে – যদি সকল নারী সেইরূপ সৎ ও পবিত্র হইতেন, তবে আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, পৃথিবীতে একটিও অপবিত্র পুরুষ থাকিত না। এমন পাশব ভাব কি আছে যাহা পবিত্রতা ও সতীত্ব জয় করিতে পারে না?"[৪] সুতরাং অপবিত্র পুরুষের জন্য যেমন নারীর অসততা দায়ী তেমনি নারীর প্রকৃত সততা ও পবিত্রতা দ্বারা পুরুষের সকল নিষ্টুরতাকে দমন করা যায় বলে স্বামীজী বিশ্বাস করতেন। পুরুষের কাঞ্চনাসক্তি থাকলেও ভারতীয় নারীর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম লক্ষণীয় – এমত প্রকাশে তিনি তাঁর ধর্মবিষয়ক বক্তৃতায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য কাহিনীর অবতারণা করেন এবং ভারতীয় হিন্দু নারী মৈত্রেয়ী প্রসঙ্গে বলেন, যেখানে মৈত্রেয়ী তাঁর পতি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে অর্থ প্রাচুর্য্য ধন-সম্পত্তি কিছুই চাননি শুধু বলেছেন : "যেনাহম্ অমৃতস্যাম, কিমহম্ তেন কুর্যাম?"[৫] অর্থাৎ, যা আমাকে অমৃত দান করতে পারে না, তা লাভ করে আমি কি করবো? কেবলমাত্র অমৃতত্ব লাভের উপায় যদি কিছু থাকে তাই তিনি জানতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ভারতীয় নারী আর্থিক নয় বরং পারমার্থিক প্রগতির দিকেই অগ্রসর হতে চেয়েছে সু-প্রাচীন কাল থেকেই। মৈত্রেয়ীর মতো বিদুষী নারী তাঁর ভূমিকার মধ্যে দিয়ে শুধু সেকালের নারীর সামাজিক উৎকর্ষতাকেই প্রতিফলিত করেনি বরং নারী শুধু যে পুরুষের চিত্ত বিনোদনের সামগ্রী নয় – আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উত্তরণের পথেও পুরুষের সমভাগী এই অনিবার্যতাকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। উনবিংশ শতকের নারী চিত্তশক্তির জাগরণে বিবেকানন্দের চিন্তনের সুদূর প্রসারী ফল বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আজও কার্যকরী বলে মনে হয়। তৎসহ শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত 'কামিনী-কাঞ্চন' তত্ত্ব থেকেও ভারতীয় নারীরা উক্ত বিবেক-বাণীতে অনেকটাই মুক্ত হয়।

ভারতীয় নারী তথা হিন্দু নারীকে তাদের শত শত বৎসরের অত্যাচার আর বন্দী দশা থেকে মুক্ত হতে উনবিংশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবুও ভারতীয় নারী পাশ্চাত্যের নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। প্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থকার লুই জ্যাকোলিও (Louis Jaccoliot) তাঁর 'ভারতে বাইবেল' গ্রন্থে লিখেছেন : "India of the Vedas entertained a respect for women, amounting to worship; a fact which we seem little to suspect in Europe when we accuse the extreme East of having denied the dignity of women, and of having only made of her an instrument of pleasure and of passive obedience."[৬] এখানে ইউরোপ চিন্তায় নারী ও ভারতীয় নারী ভাবনার মূল পার্থক্যটি চোখে পড়ে। একমাত্র ভারতীয় সভ্যতা তার প্রাচীনত্বের সুবাদে - কি পরিবারে, কি সমাজে নারী জাতিকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করেছে। কিন্তু সেই অধিকার যে কখনই পাশ্চাত্যের উগ্র বিবিয়ানা বা স্পর্ধিতা নারীবাদিত্ব হয়ে ওঠেনি তার কারণ ভারতবর্ষের ধর্মীয় সংস্কার ও নৈষ্ঠিক সমাজ অনুশীলনের প্রক্রিয়া। স্বামীজী ভারতীয় নারীর ধর্মশিক্ষার অধিকার ও ফলকে যেভাবে নির্দেশ করেছেন পাশ্চাত্যে কখনই সেভাবে হয়নি। ভারতে নারীশিক্ষা ও প্রগতি বিষয়ে স্বামীজীর স্পষ্ট ধারনা ছিল যে ধর্মকে কেন্দ্র করেই স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার করতে হবে। ধর্ম নিরপেক্ষ অন্য সকল শিক্ষাই গৌণ। ধর্ম শিক্ষা, চরিত্র গঠন ও ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ভারতে নারী শিক্ষার এই ভাবনাটি পাশ্চাত্যের নারী শিক্ষার ভাবনা থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। অন্যদিকে বিবেকানন্দ মনে করতেন নারী-প্রগতির একমাত্র পন্থাই হলো নারী শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষা ছাড়া নারীর উন্নতি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে তিনি মনে করতেন ভারতীয় নারীগণের মধ্যে একজনও যদি ব্রহ্মজ্ঞা হন তবে তার ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরিত প্রভাবে শত শত নারী সত্যব্রতে দীক্ষিত হবে এবং তাতে দেশ ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের ন্যায় ভারতীয় নারীর মধ্যেও বীরত্ব ও আত্মরক্ষার ভাব (self defence) - কে জাগিয়ে তুলতে হবে।

অতীতে (মধ্যযুগে) শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, নরকের ভয় দেখিয়ে নারীর শিক্ষা লাভের পথকে রুদ্ধ করা হয়েছিল। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্ত্র ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ওপর দোষারোপ করে বিবেকানন্দ বলেন : "এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎ সত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। ... নিয়ম নীতিতে বদ্ধ করে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine (উৎপাদনের যন্ত্র) করে তুলেছে।"[৭] সুতরাং নারীকে প্রকৃত শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্যই ভারতবাসীর অধঃপতন হয়েছে বলে তাঁর অভিমত। অন্যদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের নারীরা ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে এ কথা উপলব্ধি করেই স্বামীজীর মন্তব্য : "পাশ্চাত্যের মেয়েরা কেমন স্বাধীন, সকল কার্য ইহারাই করে। স্কুল, কলেজগুলি মেয়েতে ভরা, আর আমাদের পোড়া দেশে? মেয়েদের পথে পর্যন্ত চলিবার জো নাই।"[৮] শুধু তাই নয় প্রাচ্য পরিবারে নারীর স্বরূপ আর পাশ্চাত্যের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর উক্তি : "পাশ্চাত্যে নারী স্ত্রী-শক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে মাত্র স্ত্রীশক্তিতেই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু ভারতের একটি সাধারণ মানুষের কাছেও সমস্ত নারীশক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত। প্রাচ্য পরিবারে মাতা কর্ত্রী, স্ত্রী অবহেলিতা, পাশ্চাত্য পরিবারে স্ত্রী কর্ত্রী, জননী উপেক্ষিতা।"[৯] তুল্যমূল্য বিচারে কোনটিই একেবারে কাম্য নয়। তবু মনে হয়, দুটি ভাবধারার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করে পৃথিবীর নারীজাতির কাছে একটি আদর্শের দ্বার উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন তিনি। তবে যখন তিনি নারী জাতি সম্পর্কে সম্বোধনের

ভঙ্গিতে বলেন যে মেয়েরা মাত্রই 'মা জগদম্বার জাত' তখন প্রাচ্যের মাতৃমূর্তি বা সাক্ষাৎ দেবীমূর্তি রূপেই নারী তার আসনটি পায়। আবার পাশ্চাত্যের প্রগতিপন্থি মেয়েদের অদম্য কর্ম ক্ষমতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে যখন ঐ একই উক্তিটির উচ্চারণ করেন তখন তা হয়ে ওঠে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা এক সন্ন্যাসীর প্রকৃত জীবনদর্শন। তিনি একদিকে যেমন প্রাচ্যের নারীকে পাশ্চাত্যের নারীর বিপুল কর্মক্ষমতা, স্বাধীন-চিত্ত দৃপ্ত মানসিকতা ও সর্বপ্রকার সংস্কার বর্জিত শিক্ষার সুফল গ্রহণকে শ্রেয় বলে মনে করেছেন তেমনি পাশ্চাত্যের নারীকে (ভারতের) নারীর ভাবনা তথা দয়া, সততা ও কল্যাণময়ী মাতৃভাব গ্রহণের প্রতি আত্মনিষ্ঠ হতে বলেছেন। ভগিনী নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের জীবন-বাণীর প্রভাব এর মস্ত বড় প্রমাণ। আয়ার্ল্যান্ড দুহিতা মার্গারেট ভারতবর্ষে এসে ভারতীয়দের সেবিকা, বান্ধবী ও মা হয়ে উঠেছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও একসময় নিবেদিতাকে বলেছিলেন 'লোকমাতা'।

আইরিশ নারী মার্গারেট অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষেও ভারতবর্ষে এসে একেবারে হিন্দু হয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তৎকালীন ভারতবর্ষের অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু নিবেদিতা তাঁর গুরু বিবেকানন্দের চোখ দিয়ে নিপীড়িত ভারতবর্ষের দৈন্যতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভারতীয় নারী-সমাজকে তার স্বমহিমায় ফিরিয়ে দিতে তিনি স্বামীজীর যোগ্য সহকর্মিনী হয়ে উঠেছিলেন। নিবেদিতা তাঁর লেখা 'The Master as I saw him' গ্রন্থে বলেছেন স্বামীজীর উপদেশের কথা। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন : "I have plans for the women of my country in which I think, could be of great help to me." ভারতীয় নারীর প্রগতির জন্যে হয়তো তাঁর নিজের থেকেও কর্মপ্রাণ নিবেদিতার আত্মশক্তির উপর অধিকতর বিশ্বাস ছিল তাই দ্ব্যর্থ ভাষায় বলেছিলেন : "ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারী সমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর একজন প্রকৃত সিংহিনী প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহিয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছেনা, তাই অন্য জাতি হতে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে।"[১০] আর মার্গারেটের চিত্তবীণায় তখন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে মহতী ও শাশ্বতী সেই বেদবাণী - 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ত্বমানশুঃ' অর্থাৎ ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মনুষ্য সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করলেই ঈশ্বরসেবা ও প্রকৃত অমৃতত্ত্ব লাভের পথ প্রস্তুত হবে। সন্ন্যাসীনী মার্গারেট জানতেন ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের জন্য তাঁর গুরুদেব ভিক্ষাবৃত্তি করেছেন। ভাবী যুগের হিন্দু নারীর স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। মিস ম্যাকলয়েডকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা স্পষ্ট জানান যে বিবেকানন্দের স্বপ্ন যা সেই ভাবী যুগের নারীদের জন্যই বেঁচে থাকতে হবে তাঁকে, এছাড়া তাঁর আর অন্য কোনো অবলম্বন নাই। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে বলা স্বামীজীর সেই বাণীটি অতি উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী বলেছিলেন : "মেয়েদের মধ্যে তুমি যে কাজ করবে সেও একটা কাজের কাজ। তাদের উদ্বুদ্ধ করো। ইউরোপীয় নারী কাপুরুষকে ঘৃণা করে, তারাই ওদের পৌরুষকে জাগিয়ে রেখেছে। বাঙালী মেয়েরা কবে তাদের মতো পুরুষের দুর্বলতাকে নির্মম বিদ্রুপে লাঞ্ছিত করবে?"[১১]

"...হে বিদুষী মায়ের মায়ায়
বসুপাড়া নিজালয়ে বিদ্যালয় করিয়া স্থাপন
মূক মুখে ভাষা দিয়া জ্ঞানালোক ঢালিয়া আপন
পরের নিরাশ প্রাণে করিলে গো আশার সঞ্চার,
'নারী বিশ্বজননীর প্রতিচ্ছবি'... বুঝি নিলে সার।
'ধর্ম শুধু কথা নয়... কাজ'
এ তত্ত্ব তোমারি মাঝে মূর্ত হয়ে করিবে বিরাজ।"

বলাবাহুল্য ভগিনী নিবেদিতার মধ্যেও স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন মা জগদম্বার মূর্ত প্রকাশ। নিবেদিতা তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে ("The Master as I saw him") আবেগ ভরে বলেছিলেন : "অন্ততঃ আমার গুরুদেব মনে করতেন যে, তিনি যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, সে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের শাশ্বত, মহাব্রত হলো 'নারী ও জনগণের' জন্য প্রাণপাত করা।" জনগণের পূর্বে এখানে 'নারী' কথাটিকে স্থান দেওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

পাশ্চাত্যের নারী রূপে মার্গারেট যেমন স্বামীজীর আদর্শ মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তেমনি প্রাচ্যের আদর্শময়ী মাতৃস্বরূপিণী নারীরূপে স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছিলেন জননী সারদাকে। অপার স্নেহময়ী দেবী সারদা ছিলেন সবার মা। বিবেকানন্দ মনে করতেন মঠের শিক্ষায় নারীদের ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, ইংরেজী, সেলাই, শিল্পকর্ম, রান্না, গৃহকর্ম, শিশুপালন প্রভৃতি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হবে। নরেন ঠাকুরকে ১০৮টি বিল্বপত্র আহুতি দিয়ে (যাতে মঠের জমিটি হয় সে কারণে) মা সারদাকে সে সংবাদ দিয়েছিলেন (শ্রীশ্রী মায়ের কথা, উদ্বোধন, পৃঃ ১৯০)। দেবী সারদা তাঁর নিকট ছিলেন 'গুরুপাদপদ্ম'।

পূণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে পবিত্র মঠ প্রতিষ্ঠার পর নরেন্দ্রনাথ মা সারদেশ্বরীকে নিয়ে যান ও প্রথম পূজায় (দূর্গাপূজা) তাঁর হাত দিয়েই পুরোহিতকে দক্ষিণা দান করান। মা সারদার দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গই ছিল নিত্য সকাল-সন্ধ্যা জপ, ধ্যান, দান ও প্রার্থনা। অহংকার-শূন্যতা তাঁর চরিত্রের অঙ্গ ছিল। নরেন্দ্রনাথ সহ সকল রামকৃষ্ণ আশ্রিত ভক্ত কূলের কাছেই তাঁর বক্তব্য ছিল : "মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার এক জন মা আছেন।" (শ্রীশ্রী মায়ের কথা, উদ্বোধন, পৃঃ ৫৯) তিনি সতেরও মা, অসতেরও মা। নিবেদিতার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। নিবেদিতা সহ সিস্টার কৃস্টিনের কাছে মঠের স্কুল সম্পর্কে তিনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতেন। এই মঠের সন্ন্যাসীনী ও ব্রহ্মচারিণীগণ পরবর্তীতে শিক্ষয়িত্রী ও ধর্মপ্রচারিকা হতেন। শহর ও গ্রামে নারী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে তাঁরা সেবা ব্রতের আদর্শে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটাতেন। একবার মা সারদা দেবী নিবেদিতার স্কুল দেখতে এলে নিবেদিতা তাঁকে স্কুলের মেয়েদের হাতের কাজ দেখান। মা সামান্য একটা পশমের তৈয়ারী ছোট পাখা

নিবেদিতাকে উপহার দিলে সিস্টার তাতে আনন্দে আত্মহারা হন। সেই নিবেদিতা সম্পর্কে মা সারদা বলেন : 'আহা, কি সরল বিশ্বাস। যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে (স্বামীজী) কি ভক্তিই করে! সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরু ভক্তি! এদেশের উপরই বা কি ভালোবাসা।" (ঐ, পৃঃ ৩০৮) নিজে অতি সামান্য লেখাপড়া জানলেও নিবেদিতার স্কুলের প্রতি তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল। তাঁর চারিত্রিক আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে বিদেশিনীরাও (মেম) তাঁর কাছে এসে সাগ্রহে দীক্ষা নিতেন। স্ত্রী-মঠের পাশাপাশি তৎকালে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল।

বিবেকানন্দ প্রবর্তিত স্ত্রী-মঠের শিক্ষায় মা সারদার লৌকিক জীবনাচরণগুলি বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। স্ত্রীলোককে প্রহার, স্ত্রীলোকের বন্দীত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলির বিরোধিতা করেছিলেন মা সারদা। তিনি মনে করতেন পুরুষের কাছে সন্ন্যাস হলো ত্যাগের আদর্শ। কিন্তু নারীর আদর্শ হলো সন্ন্যাসের আশ্রয়ে থেকে পুরুষ ও গৃহের কল্যাণসাধন। দেশের নারীশিক্ষার প্রগতি সম্পর্কে প্রদেশে প্রদেশে যে পার্থক্য তাঁর চোখে পড়েছিল তা তাঁর ভাষায় : "মাদ্রাজের দুটি মেয়ে, বিশ-বাইশ বছর বয়স, বিবাহ হয় নাই, নিবেদিতা স্কুলে আছে। আহা! তারা সব কেমন কাজকর্ম শিখেছে। আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছর হতে না হতেই বলে - 'পর গোত্র করে দাও, পর গোত্র করে দাও'। আহা, রাধুর যদি বিয়ে না হতো, তাহলে কি এত দুঃখ দুর্দশা হতো!" (ঐ, পৃঃ ১৩১) অর্থাৎ বাল্য-বিবাহের কুফল সম্পর্কে মা-ও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ভারতীয় (বিবাহিত) নারী সম্পর্কে সারদা মায়ের বক্তব্যটি ছিল এরূপ : "শৈশবে বাপ-মায়ের কোল, যৌবনে স্বামীর আশ্রয় ছাড়া মেয়েদের আর কেউ আবরুতে পারেনা। মেয়েলোক বড় খারাপ জাত, ফস্ করে একটা কথা যদি কেউ বলেই ফেললে গো! মানুষের তো কথা - বললেই হলো! তাই দুঃখ কষ্ট সয়েও (স্বামী বা বাপ-মায়ের কাছে) থাকতে হয়।" (ঐ, পৃঃ ১৯) ভারতীয় নারীর ঐতিহ্য সম্পর্কে এই ছিল মায়ের দৃষ্টিভঙ্গী। নারী সম্পর্কে সারদা মায়ের যাবতীয় চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন পড়েছিল বিবেকানন্দের ভারতীয় নারীর আদর্শ কল্পনায়।

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ভারতীয় নারীর সংজ্ঞা ছিল - পরম শুদ্ধ স্বভাবা, পতি পরায়ণা, সর্বংসহা সীতার মত হওয়া। তাই তিনি বলেছেন : "আর কোনো পৌরাণিক কাহিনীতে এমন কোনো চরিত্র নেই যা সীতার আদর্শের মতো সমগ্র জাতির জীবনে পরিব্যপ্ত হয়েছে। ... ভারতে যা কিছু সৎ, বিশুদ্ধ ও পবিত্র, সীতা হচ্ছে তারই নাম।"[১২] প্রাচ্যের নারী যদি বেদান্তের আদর্শকে পাশ্চাত্যের সামাজিক আঙিনায় প্রোথিত করতে পারেন তবে ভারতের নারীধর্ম ব্রত তাদের নিকটও গ্রহণীয় হবে বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। এ প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা ঠাকুরবাড়ীর স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা ঘোষালের উদ্দেশ্যে ১৮৯৭ সালের ২৪শে এপ্রিল লিখিত একটি পত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত হিন্দু নারী হিসাবে সরলা ঘোষালের গুণ বর্ণনা করে তিনি বলেন : "পাশ্চাত্য দেশে নারীর রাজ্য, নারীর বল, নারীর প্রভুত্ব। যদি আপনার ন্যায় তেজস্বিনী বিদুষী বেদান্তজ্ঞা কেউ এই সময়ে ইংলন্ডে যান আমি নিশ্চিন্ত বলিতেছি এক এক বৎসরে অন্ততঃ দশ হাজার নর-নারী ভারতের ধর্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবে।"[১৩] একদিকে ইংলন্ড ও অন্যদিকে আমেরিকা। ভারতবর্ষের নানাবিধ সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার নারী সমাজ কতটা এগিয়ে তা সমকালীন সমাজ সংস্কারক ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের বক্তব্যেই জানা যায়। তিনি বলেন : "সমাজে মেয়েদের বাল্যবিবাহ বন্ধ হওয়া উচিৎ। আমেরিকায় আমি দেখিয়াছি মেয়েরা কত শিক্ষিত। সেখানে অবিবাহিত ও শিক্ষিত নারীগণ অনেকেই পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করে। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত অন্ততঃ বালিকাদিগকে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ও অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষাদান করা কর্তব্য।"[১৪] সুতরাং উনবিংশ শতকে প্রাচ্যের (ভারতের) নারীকূলের মতো বিদেশেও নারীর শিক্ষা, সংযম ও পবিত্রতাকে লক্ষ্য করা যায়। বলাই বাহুল্য আজকের পাশ্চাত্য নারী সমাজ অনেকাংশেই সেই গুণগুলিকে উগ্র আধুনিকতার মোহে হারাতে বসেছে। উনবিংশ শতকের আমেরিকায় স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে, বরং সেদিক থেকে ভারতবর্ষ পিছিয়ে ছিল। বুদ্দিমত্তা বা 'আই-কিউ' এর বিচারে স্ত্রীলোকেরা সেখানে পুরুষের অপেক্ষা এগিয়ে ছিল। তাঁর মতে আমেরিকায় পুরুষদের অপেক্ষা নারীরাই অধিক শিক্ষিত এবং বিশ্বযুদ্ধের সময় পুরুষেরা যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়েছিল তখন সেখানে নারীরাই গৃহকর্মের ভার গ্রহণ করেছিল। মিত্র শক্তির সহিত শান্তি স্থাপনের কারণ হিসাবেও সেখানে একমাত্র ছিল নারী। যুদ্ধক্ষেত্রেও পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিল। ভারতবর্ষে সর্ব বিষয়ে মেয়েদের গুরুত্ব দান করা হয়নি। শুধু জগজ্জননীরূপ শক্তির আসনে নয়, নারী যতদিন না তা যথার্থ মর্যাদার আসনটি ফিরে পাবে - ততদিন তার পক্ষে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয় বলে মনে করতেন স্বয়ং স্বামীজীও। স্বামী অভেদানন্দ আরও বলেন : "আমেরিকায় স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বে বিবাহ করিতে চায়না। কোন কোন স্ত্রীলোক আবার একেবারে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নয়। পুরুষেরাও সেখানে ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্বে নিজেদের বিবাহের উপযুক্ত বলিয়া মনে করে না, অথচ তাহাদের স্বভাব ও চরিত্র নির্মল ও পবিত্র।"[১৫] তৎকালীন হিন্দুদের বাল্যবিবাহ বা অল্প বয়সে বিবাহের পরিপ্রেক্ষিতে উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক যোগ্যতা সম্পন্ন নর-নারীর বিবাহ সকল দেশেই কাম্য। আধুনিক কালে ভারত তথা পৃথিবীর অন্যান্য দরিদ্র দেশগুলির মানুষদের (নর-নারী) মধ্যেও বেশীরভাগ সময়েই - সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কালবিলম্ব ঘটায়, তাদের বৈবাহিক তথা গৃহীজীবনের সূত্রপাতেও বিলম্ব ঘটছে।

ভারতীয় নারীর প্রেম ও বিবাহ প্রসঙ্গে স্বামীজীর অভিমত ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। অভেদানন্দের ন্যায় ভারতীয় নারীর বাল্যবিবাহকে তিনি কখনই সমর্থন করেন নি। শিক্ষালাভ করলে মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। বিবাহের ক্ষেত্রেও তাই। কন্যাকে স্বাবলম্বী করে তোলার শিক্ষা না দিয়েই যে পিতা কন্যার বিবাহ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হন বিবেকানন্দ তার কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। দশম বৎসর বয়স্কা কন্যা সন্তানকে যে পিতা বিবাহ দিতে চান তিনি মহাপাপী। পণপ্রথার বিরোধিতা পূর্বক

তিনি 'দুহিতা' শব্দটিরও ব্যাখ্যা করেন এই বলে যে – 'দোহনকারিণী' অর্থাৎ সামাজিক কু-প্রথার বলি যে কন্যা 'পরিবারের সমস্ত দুগ্ধ দোহন করিয়া লইয়া যায়'। এও হলো দ্বিতীয় অর্থ। বিবাহিতা নারী স্বামীর উপর নির্ভরশীল হবেন না। যথার্থ শিক্ষালাভে তিনি যাতে স্বনির্ভর হয়ে ওঠেন সেদিকেই তার জোর দেওয়া উচিৎ। একদিকে বিবেকানন্দ যেমন পুরুষের কৌলিন্য প্রথাকে সমর্থন করেন নি তেমনই অন্যদিকে বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছেন। যদিও বিধবা বিবাহের সবদিক গুলি যুক্তি সঙ্গত ভাবেই সর্বাংশে মেনে নিতে পারেন নি। আসলে সমাজ সংস্কার বিষয়ে বিবেকানন্দ অত্যন্ত বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন।

ভারতীয় নারীর প্রেম ও বিবাহের বিপরীতে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যপন্থী নর-নারীর প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীটির ব্যাখ্যাও স্বামীজীর বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। তিনি বলেন : "ইংরেজ ও আমেরিকানরা কথাবার্তায়ও বড় সাবধান, মেয়েদের সামনে। ...কিন্তু প্রেম-প্রণয়ের কথা অবাধে মায় ছেলে, ভায়ে বোনে বাপে – তা চলছে। বাপ মেয়ের প্রণয়ীর কথা নানারকম ঠাট্টা করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছে। ফরাসীর মেয়ে তায় অবনতমুখী, ইংরেজের মেয়ে ব্রীড়াশীলা, আর মার্কিনের মেয়ে চোটপাট জবাব দিচ্ছে। ...আমাদের দেশে প্রেম-প্রণয়ের নামগন্ধটি পর্যন্ত গুরুজনের সামনে হবার জো নেই।"[১৬]

১৯০০ সালের ১৮ই জানুয়ারী ক্যালিফোর্ণিয়ার পাসাডেনস্থিত সেক্সপীয়ার ক্লাবে প্রদত্ত একটি ভাষণে স্বামীজী ভারতীয় নারী সম্পর্কে বলেন : "ভারতীয় নারীর আদর্শ হচ্ছে মাতৃত্ব। মাতৃত্বই হচ্ছে ভারতীয় নারীর প্রথম এবং শেষ কথা। 'নারী' শব্দটি ভারতীয় হিন্দুকে মাতৃত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনকি ঈশ্বরকেও তারা মাতা বলে।"[১৭] অন্যদিকে পাশ্চাত্য নারী সম্পর্কে তাঁর মত হলো : "পাশ্চাত্যে নারীর রূপ হলো স্ত্রী। সেখানে নারীত্বের সমস্ত ধারণা বা আদর্শ স্ত্রীরূপের মধ্যে কেন্দ্রিভূত থাকে। ... পাশ্চাত্যের গৃহগুলিতে স্ত্রী-ই সর্বময়ী কর্ত্রী। কিন্তু ভারতের গৃহগুলিতে মা-ই সর্বময়ী কর্ত্রী।"[১৮] অর্থাৎ নারীত্বের সংজ্ঞায় 'মাতৃত্ব' ও 'স্ত্রীত্ব' এই দুই রূপের মধ্যে একটা স্পষ্ট ভেদরেখা টানতে চান স্বামীজী। বলা বাহুল্য তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যের নিরিখেই। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তাঁর মাতা ভূবনেশ্বরী দেবীর অবদান ছিল অসামান্য। জগৎবাসীর কাছে তাঁর মাতৃবাণীর ঘোষণা ছিল মাতা ভূবনেশ্বরী দেবীর অকৃতিম স্নেহ ও ভালোবাসারই ফল। পাশ্চাত্যের মাটিতে ভারতীয় মাতা-পুত্রের এই পারস্পরিক আন্তরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ককে তিনি আর কোথাও খুঁজে পাননি। পাশ্চাত্যের বুকে বসে তিনি এমন পুত্রকে কোথাও খুঁজে পাননি যে সমাজজীবনে তার জননীকেই সর্বাগ্রগণ্যা মনে করে। ভারতীয়রা চান না মৃত্যুকালেও তাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা জননীর স্থান অধিকার করুক। তিনি বলেন : "ইনিই হচ্ছে আমাদের মা। আমরা যাঁর কোলে মাথা রেখে মরতে চাই। যদি অবশ্য তাঁর আগে আমার মৃত্যু হয়।"[১৯] অন্যত্র তিনি বলেন :"মাতৃ স্নেহই আমাদের এই মরজগতে ঈশ্বরপ্রেমের নিকটতম প্রকাশ।"[২০] পাশ্চাত্যের ন্যায় নারীকে তিনি কখনোই জড়দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কেবলমাত্রই রক্তমাংসের মানবী বলে ভাবতে পারেন নি। নারীর পবিত্রতা তার মাতৃত্বে, যা ভারতের আদর্শ। দেহের আসক্তি বা লালসার বিচারে পুরুষের কাছে নারীর যে মূল্য অথবা অগ্রাধিকার তাকে তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রত্যাঘাত করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বীয় গুরুর শিক্ষার গুণ, সন্ন্যাসীর রীতি ও অভ্যাসবশে সকল মহিলাদেরকে তিনি মাতৃ সম্বোধন করতেন। কিন্তু মহিলারা প্রায়শঃই তাতে আতংকিত হতেন। স্বামীজীর বক্তব্য ছিলো মাতৃ সম্বোধন করলেই মহুলারা বৃদ্ধা বা সৌন্দর্য্যহীনা হয়ে যান না। ভারতে জায়া জননীর পিছনে চলে ছায়ার মতো, আর পিতা ও সন্তানের শাসনের মাঝে এসে দাঁড়ান করুণাময়ী মাতা। পুত্র অবাধ্য হলেও মাতার স্নেহময় সমর্থন সর্বদা পুত্রের স্বপক্ষেই ক্রিয়াশীল থাকে, এমনই ভারতের মাতৃত্বস্বরূপিনী নারীর অস্তিত্ব। বিবেকানন্দের এ বক্তব্য থেকেই ভারতীয় পরিবারতন্ত্রে পিতার কর্তৃত্বের পাসাপাশি সর্বংসহা মাতার আদর্শ ও স্থানটিও চিহ্নিত হয়ে যায়। বিদেশে পুত্রের শাস্তি দাতা প্রায়শঃই তার মাতা। সুতরাং মাতা সেখানে তার মাতৃসুলভ ক্ষমা ও করুণার বিচারে কখনই স্বচ্ছ নন। ভারতীয় মাতা কদাপি পুত্রকে অভিশাপ দেন না। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতিতেই কুপুত্র সুলভ, কিন্তু ভারতীয় সমাজে 'কুমাতা' কখনও সুলভ নন বলেই তাঁর বিশ্বাস। এমনকি স্বয়ং ঈশ্বরকেও ভারতীয়রা মাতৃরূপে, শক্তিরূপিনী সয়ম্ভূ দেবী রূপে পূজা করে থাকেন। স্বয়ং সারদা দেবীও শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর পতিরূপে নয় বরং গুরুরূপে গ্রহণ করেই স্বেচ্ছায় ও পরমানন্দে তাঁর উপদেশ অনুসারে আকুমার ব্রহ্মচারিণী রূপে ভগবৎ সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। এই প্রচন্ড নিষ্ঠা ও সংযম একমাত্র ভারতীয় নারীর পক্ষেই সম্ভব।

পাশ্চাত্যের নারীকূলের কাছে বিবেকানন্দের জিজ্ঞাসা ছিল – তাঁরা মাতৃত্বের আগমনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন কিনা? অথবা মাতৃত্বের কারণে তাঁরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান কিনা? মাতৃত্বের দ্বারা যে পবিত্রতার জন্ম হয় তাই-ই পাশ্চাত্য নারীর কাম্য হওয়া উচিৎ, নাহলে তাদের বিবাহ, নারীত্ব অথবা শিক্ষা সকলই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অন্যত্র তিনি পাশ্চাত্যে নারী শিক্ষার প্রশংসা করেছেন কিন্তু 'ভারতের নারী' প্রবন্ধে পাশ্চাত্য নারীর কালেজি শিক্ষা বা বিদ্যাবত্তা থেকেও মাতৃত্বের দায়িত্ববোধকে অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। ভারতীয় দম্পতি সন্তান লাভের পূর্বে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন এবং ঈশ্বরের মতোই কল্যাণময় এক সত্তাকে সন্তান রূপে কামনা করেন। পুরুষকে উচ্চভাবের প্রেরণা দিতে গেলে ও বীর পুত্রের জননী হতে গেলে তার আগে ভারতীয় নারীকে অবশ্যই শিক্ষিতা হতে হবে। এ প্রসঙ্গে 'মাতৃত্ব' ও 'স্ত্রীত্ব'কে একটি সংযোগ সুত্রে বাঁধতে চান তিনি। নিজের জননীর প্রসঙ্গ এনে বলেন : "আমার জননী হচ্ছেন সেই স্বাধ্বী, যিনি আমাকে এই পৃথিবীতে এনেছেন। আমি জন্ম নেবো বলে তিনি তাঁর দেহ, তাঁর মন, তাঁর খাদ্য, বেশভূষা, তাঁর চিন্তা কল্পনা, বছরের পর বছর পবিত্র ও শুচিশুদ্ধ রেখেছেন। যেহেতু তিনি এইসব করেছেন, এই মহাতপস্যায় সিদ্ধ হয়েছেন, সেহেতুই তিনি আমার উপাসনার যোগ্য। এর থেকে কি বোঝায়? এর থেকে বোঝায় যে মাতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মধ্যে আছে স্ত্রীত্ব।"[২১] উক্তিটির মধ্যে দিয়ে ভারতের 'মাতৃত্ব' ও পাশ্চাত্যের 'স্ত্রীত্ব'কে একটি ভাবাদর্শে মেলাতে চান তিনি।

নারীশিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দ আরো মনে করতেন যে নারীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনেকাংশে পুরুষজাতির উপর নির্ভর করে। যে দেশে পুরুষরা উচ্চ সংস্কৃতি সম্পন্ন, সে দেশে নারীরাও উচ্চ সংস্কৃতি সম্পন্না। এক্ষেত্রে হার্বার্ট স্পেন্সারের রচনার কথা উল্লেখ করে বলেন যে যাকে হার্বার্ট স্পেন্সার আশ্রমিক শিক্ষা বলেছেন তা একসময় ইউরোপের সর্বত্র প্রচলিত ছিল এবং তার সুফলও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় – যেখানে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের মতো দুটি বিশ্ববিদ্যালয়, (যা পুরুষদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত) একদা নারীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, সেখানে ইউরোপীয় শিক্ষার আদর্শে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেকালে নারী শিক্ষার জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। আশ্রমিক শিক্ষারীতি সম্মত একই মানের শিক্ষা এবং একই মানের পাঠক্রম সম্বলিত শিক্ষার আয়োজনেই ভারতীয় নারী – পুরুষ শিক্ষার সাম্যে উপনীত হতে পারবে বলে মনে করতেন স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারতীয় নারীর সর্বংসহা রূপকে তিনি রামায়ণের সীতার সাথে তুলনা করেছেন। সীতার মধ্যে কোনোরূপ প্রত্যাঘাতের অসদিচ্ছা ছিল না বরং শত দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত সীতা নিজের সতীত্ব ও নারীত্বকে সর্বাংশে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এ আদর্শ ভারতীয় নারীর। এ প্রসঙ্গে বিদেশ থেকে হরিপদ মিত্রকে লেখা (২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩) স্বামীজীর একটি পত্রের কথা উল্লেখ করতে হয়। সেখানে তিনি বলেন : "বিশেষ এ দেশে দরিদ্র ও স্ত্রী দরিদ্র নাই বলিলেই হয় ও এ দেশের স্ত্রীদের মতো কোথাও দেখি নাই। সৎ পুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এ দেশের মেয়েদের মতো মেয়ে বড়ই কম। 'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু' – যে দেবী সুকৃতী পুরুষের গৃহে স্বয়ং শ্রীরূপে বিরাজমান।"[২২] আবার পাশ্চাত্যের মাটিতে ধবল তুষারের ন্যায় যে নারীদের তিনি দেখেছেন তাঁরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছে, খেতে দিয়েছে – লেক্চার দেবার সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। এদিক থেকে পাশ্চাত্যের নারীদের কাছে তিনি ছিলেন অসীম ঋণে ঋণী। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নারীদের বিষয়ে তিনি সমভাবেই ব্যথিত হন যখন দেখেন এদেশে বালবিধবার অশ্রুপাতে ধরিত্রী আর্দ্র হয় আর পাশ্চাত্য দেশের বায়ু অনূঢ়া কুমারীগণের দীর্ঘশ্বাসে বিষাক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে তাঁর এ ভাবনার যথার্থতা মেনে নিতেই হয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নারীকুলের পোশাক, ফ্যাসান ও রীতিনীতির প্রসঙ্গে যে বর্ণনাটি স্বামীজী তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেন তার কিছু সমালোচনা করা হয়। তবে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধ সাপেক্ষে স্বামীজী প্রদত্ত বর্ণনাটি তুলনামূলক ভাবে অত্যন্ত বাস্তব সম্মত বলেই মনে হয়।

মূলতঃ বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষে কোনো ভেদ ছিল না। কি ব্যবহারিক, কি আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রেই সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্তি ঘটিয়ে মানব জীবনের পরম লক্ষ্য যে সত্য লাভ, সে পথে নারী ও পুরুষ যে সমান অংশভাগী তা তিনি সর্বদা মনে করতেন। আধুনিক ভারতে স্বামীজীর বাণীতেই আমরা প্রায় পূর্ণ নারীসত্তার জাগরণের পরিচয় পাই। ব্রহ্মচর্যসিদ্ধ, সোহং মন্ত্রস্তব্ধ ভাবনায় বিবেকানন্দ ব্যক্তিজীবনে কখনও নিঃসঙ্গ নন বরং দেহাতীতের সাধনপথ তিনি নির্মাণ করেছিলেন অধ্যয়নে, নিদিধ্যাসনে। আর ব্রহ্মের সাধনার পথে, দেশের মঙ্গল কামনায় – নারীকে দিয়েছিলেন এক সর্বাগ্রগণ্য স্থান। প্রায় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ ভোগাকাঙ্খা আর উন্মত্ততার মারণান্তিক যন্ত্রণা। কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি সর্বত্রই তার কালো ছায়া। এই বিকৃতি আর বীভৎসতার মাঝে কে করবে সত্য-সুন্দরের অন্বেষণ? আজকের মেয়েরা ক্রমশঃ নিজের কর্মদক্ষতা অপেক্ষা পুরুষের কটাক্ষকেই নিজেদের জয়ের অস্ত্র বলে ভাবতে লজ্জাবোধ করছে না। পুরুষের চোখে শ্রদ্ধেয় হবার থেকে আকর্ষণীয়া হবার দিকেই তার ঝোঁক বেশী। নিরন্তর চলচ্চিত্র, টি.ভি., বিনোদন সেই অগ্নিতে করে চলেছে ঘৃতাহুতি। এসময় স্বামীজীকে বড়ো প্রয়োজন। স্বামীজী জানতেন যে মেয়েদের পূজা করেই সব জাতি বড় হয়েছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নেই সে দেশ, সে জাতি কখনও বড় হতে পারেনি, পারবেও না। সমগ্র পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে নারীকে যিনি এতখানি সম্মানের আসন দিয়েছিলেন পুরুষের পাশাপাশি নারীর সেই – শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন রক্ষা করার দায়িত্ব আজ সে নারীদেরই। বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের বাধা কাঠিয়ে, বিবেক-বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নারীকেও তাই আবারও যথার্থ অর্থেই নিজেদের পূজার যোগ্য করে তুলতে হবে।

তথ্যসূত্র :

১। পত্রাবলী, সরলা ঘোষালকে লেখা পত্র (২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৭), বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পৃঃ ৭২০।
২। দেববাণী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৪র্থ খন্ড); পৃঃ ১৭৭।
৩। ভারতের নারী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৫ম খন্ড), পৃঃ ৩৩৫-৩৩৭।
৪। কর্তব্য কি? স্বামীজীর বাণী ও রচনা (১ম খন্ড), পৃঃ ৭১।
৫। যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (১ম খন্ড), পৃঃ ৫৪৬।
৬। 'হিন্দুধর্মে নারী', হুন্দু নারী, স্বামী অভেদানন্দ, পৃঃ ১৫।
৭। স্বামী শিষ্য সংবাদ, স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৯ম খন্ড), পৃঃ ৬৭।
৮। পত্রাবলী, হরিপদ মিত্রকে লিখিত পত্র (২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩), বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পৃঃ ৮০৪।
৯। ভারতের নারী, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (২য় খন্ড), পৃঃ ৫৩২।
১০। 'নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব', উষা দেবী সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, পৃঃ ১২৬।

১১। 'নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব', উষা দেবী সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, পৃঃ ১২৯।
১২। রামায়ণ, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (১ম খন্ড), পৃঃ ৪২৩-৪২৫।
১৩। পত্রাবলী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পৃঃ ৩৩৪।
১৪। সঞ্চয়ণ, হিন্দুনারী, স্বামী অভেদানন্দ, পৃঃ ৫১।
১৫। সঞ্চয়ণ, হিন্দুনারী, স্বামী অভেদানন্দ, পৃঃ ৫২।
১৬। রীতিনীতি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (১ম খন্ড), পৃঃ ২৯।
১৭। ভারতের নারী, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (২য় খন্ড), পৃঃ ৫৩২।
১৮। ভারতের নারী, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (২য় খন্ড), পৃঃ ৫৩২।
১৯। ভারতের নারী, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (২য় খন্ড), পৃঃ ৫৩৩।
২০। ভারতের নারী, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (২য় খন্ড), পৃঃ ৫৩৩।
২১। ভারতের নারী, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (২য় খন্ড), পৃঃ ৫৩৫।
২২। পত্রাবলী, হরিপদ মিত্রকে লিখিত পত্র (২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩), বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পৃঃ ৮০৩-৮০৪।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। হিন্দুনারী – স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৪০৮।
২। বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (১ম ও ২য় খন্ড), অনুবাদ ও সম্পাদনা সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ, কামিনী প্রকাশালয়, বৈশাখ, ১৪১৭।
৩। শ্রীশ্রী মায়ের কথা (অখন্ড) – উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ৩৮তম পুনর্মুদ্রণ, মাঘ, ১৪১৭।
৪। যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১ম খন্ড), স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৮৭।
৫। পত্রাবলী – স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৭।
৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা – উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬৪।
৭। The Master as I saw him – Sister Nivedita, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা।

*****